

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৫

প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১৮

সূরা ইনফিতার

সূরা আল-ইনফিতার কুরআনের ৮২ তম সূরা, এর আয়াত সংখ্যা ১৯; রুকু সংখ্যা ১। সূরা আল-ইনফিতার মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইনফিতার, অর্থ : বিদীর্ণ করা।

নামকরণ:

প্রথম আয়াতের শব্দ (! نَفْطَرْتُ) থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে। এর মূলে রয়েছে ইনফিতার অর্থাৎ ফেটে যাওয়া। এ নামকরণের কারণ হচ্ছে এই যে, এ সূরায় আকাশের ফেটে যাওয়ার কথা আলোচনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল :

এই সূরার ও সূরা আত তাকভীরের বিষয়বস্তুর মধ্যে গভীর মিল দেখা যায়। এ থেকে বুঝা যায়, এই সূরা দুটি প্রায় একই সময়ে নাযিল হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য:

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে আখেরাত। মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনুল মন্যার, তাবারানী, হাকেম ও ইবনে মারদুইয়ায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের (রা.) একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনটি নিজের চোখে দেখতে চায় সে যেন সূরা তাকভীর, সূরা ইনফিতার ও সূরা ইনশিকাক পড়ে নেয়।” এখানে প্রথমে কিয়ামতের দিনের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তি দুনিয়ায় যা কিছু করেছে কিয়ামতের দিন তা সবই তার সামনে উপস্থিত হবে। তারপর মানুষের মনে অনুভূতি জাগানো হয়েছে, যে সৃষ্টিকর্তা তোমাকে অস্তিত্ব দান করলেন এবং যাঁর অনুগ্রহে তুমি আজ সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে সবচেয়ে ভালো শরীর ও অংগ- প্রত্যংগ সহকারে বিচরণ করছো, তিনি কেবল অনুগ্রহকারী ইনসাফকার নন, তাঁর সম্পর্কে তোমার মনে কে এই প্রতারণার জাল বিস্তার করলো ? তাঁর অনুগ্রহের অর্থ এ নয় যে, তুমি তাঁর ন্যায়নিষ্ঠ ব্যবহার ও বিচারের ভয় করবে না। তারপর মানুষকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে, তুমি কোন ভুল ধারণা নিয়ে বসে থেকো না। তোমার পুরো আমলনামা তৈরী করা হচ্ছে। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য লেখকরা সবসময় তোমার সমস্ত কথাবার্তা, গুণাবলি, চলাফেরা ও যাবতীয় কাজকর্ম লিখে চলছেন। সবশেষে পূর্ণ দৃঢ়তা সহকারে বলা হয়েছে, অবশিষ্ট একদিন কিয়ামত হবে। সেদিন নেককার লোকেরা জান্নাতে সুখের জীবন লাভ করবে এবং পাপীরা জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে। সেদিন কেউ কারোর কোন কাজে লাগবে না। বিচার ও ফায়সালাকারী সেদিন হবেন একমাত্র আল্লাহ।

পূর্বের ও পরের সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরা তাকভীরে কিয়ামতের ভয়াবহতা এবং রাসূল ও কুরআনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের কথা আলোচিত হয়েছে। সূরা ইনফিতারে প্রথমে দুনিয়া প্রলয় হওয়ার কথা আলোচিত হয়েছে। সূরা ইনফিতারে আকিদা ও বিশ্বাসের ব্যাপারে পথ নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান ও পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণের তাকীদ রয়েছে। আর আখেরাতের প্রতি ঈমান না থাকার কারণে মানুষ বান্দার হক আদায় করে না। পরিণামে শাস্তি অবধারিত উল্লেখ রয়েছে। আর পরের সূরা মুতাফফিফীন-এ যারা ওজনে ফাঁকি দেয়, ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়। তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন।

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ

১. যখন আসমান বিদীর্ণ হবে,

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ

২. আর যখন নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে,

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ

৩. আর যখন সাগরগুলো বিক্ষোবিত করা হবে,

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ

৪. আর যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে

কিয়ামত শুরুর প্রাক্কালে আকাশের অবস্থা কেমন হবে তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন : انْتَثَرَتْ অর্থ বা তারকারাজি বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়া। فُجِّرَتْ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন : একটি অন্যটির মাঝে উদ্বেলিত করবেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : লবণাক্ত ও মিষ্টি পানি সব একাকার হয়ে যাবে। ফলে সব সাগর এক সাগরে পরিণত হয়ে যাবে। (ইবনু কাসীর)

সূরা তাকভীরে বলা হয়েছে, সমুদ্রগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে এবং এখানে বলা হয়েছে, সমুদ্রগুলোকে ফাটিয়ে ফেলা হবে। এই উভয় আয়াতকে মিলিয়ে দেখলে এবং কুরআনের দৃষ্টিতে কিয়ামতের দিন এমন একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প হবে যা কোন একটি বিশেষ এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং একই সময় সারা দুনিয়াকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে দেবে, এ বিষয়টিকেও সামনে রাখলে সমুদ্রগুলোর ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়ার ও তার মধ্যে আগুন লেগে যাবার প্রকৃত অবস্থাটি আমরা অনুধাবন করতে পারি। আমরা বুঝতে পারি, প্রথমে ঐ মহাভূমিকম্পনের ফলে সমুদ্রের তলদেশ ফেটে যাবে এবং সমুদ্রের পানি ভূগর্ভের অভ্যন্তরভাগে নেমে যেতে থাকবে যেখানে সর্বক্ষণ প্রচণ্ড গরম লাভা টগবগ করে ফুটছে। এই গরম লাভার সাথে সংযুক্ত হবার পানি তার প্রাথমিক অবস্থায় অর্থাৎ প্রাথমিক দু’টি মৌলিক উপাদান অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে পরিণত হবে। এর মধ্যে অক্সিজেন আগুন জ্বালানোয় সাহায্য করে এবং হাইড্রোজেন নিজে জ্বলে উঠে। এভাবে প্রাথমিক মৌলিক উপাদানে পরিণত হওয়া ও আগুন লেগে যাওয়ার একটি ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া (chain reaction) চলতে থাকবে। এভাবে দুনিয়ার সবগুলো সাগরে আগুন লেগে যাবে। এটা আমাদের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ভিত্তিক অনুমান। তবে এর সঠিক জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নেই।

প্রথম তিনটি আয়াতে কিয়ামতের প্রথম পর্বের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই আয়াতে দ্বিতীয় পর্বের কথা বলা হয়েছে। কবর খুলে ফেলার মানে হচ্ছে, তা খুলে তা থেকে মানুষকে আবার নতুন করে জীবিত করে উঠানো।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ

৫. তখন প্রত্যেকে জানবে, সে কী আগে পাঠিয়েছে ও কী পিছনে রেখে গিয়েছে।

আকাশ বিদীর্ণ হওয়া, নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়া, সমুদ্র একাকার হয়ে যাওয়া, কবর থেকে মৃতদের বের হয়ে আসা ইত্যাকার কিয়ামতের ঘটনা যখন ঘটে যাবে, তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়েছে। মূলে বলা হয়েছে, (مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ) এ শব্দগুলোর কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং সবগুলো অর্থই এখানে প্রযোজ্য। এক. যে ভালো ও মন্দ কাজ করে মানুষ আগে পাঠিয়ে দিয়েছে তাকে قَدَّمَتْ এবং

যেগুলো করতে সে বিরত থেকেছে তাকে একে أَخْرَجْتُ ۞ বলা যায়। সুতরাং কেয়ামতের দিনে প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে সৎ অসৎ কি কর্ম করেছে এবং কি সৎ অসৎ কর্ম করেনি। [তাবারী] দুই, যা কিছু প্রথমে করেছে তা قُتِلْتُ ۞ এবং যা কিছু পরে করেছে তা أَخْرَجْتُ ۞ এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সম্পাদনের ধারাবাহিকতা ও তারিখ অনুসারে মানুষের প্রত্যেকটি কাজের হিসেব সম্বলিত আমলনামা তার সামনে এসে যাবে। [মুয়াস্সার] তিন, যেসব ভালো বা মন্দ কাজ মানুষ তার জীবনে করেছে সেগুলো (قُتِلْتُ ۞) এর অন্তর্ভুক্ত। এ মানুষের সমাজে এসব কাজের যে প্রভাব ও ফলাফল সে নিজের পেছনে রেখে এসেছে সেগুলো أَخْرَجْتُ ۞ এর অন্তর্ভুক্ত। কাজটি সৎ হলে তার সওয়াব সে পেতে থাকবে এবং অসৎ হলে তার গোনাহ আমলনামায় লিখিত হতে থাকবে। হাদীসে আছে “যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম সুন্নত ও নিয়ম চালু করে সে তার সওয়াব সবসময় পেতে থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন কুপ্রথা অথবা পাপ কাজ চালু করে যতদিন মানুষ এই পাপ কাজ করবে ততদিন তার আমলনামায় এর গোনাহ লিখিত হতে থাকবে।” [তিরমিযী: ২৬৭৫, ইবনে মাজহ: ২০৭, মুসনাদে আহমাদ: ২/৫০৪] [আত-তাফসীরুস সহীহ]

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

৬. হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান রব সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল?

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে ধমক দিয়ে বলেনঃ হে মানুষ! কিসে তোমাদেরকে প্রতিপালক হতে প্রতারিত করলো? আল্লাহ তা'আলা যে, এ কথার জবাব চান বা শিক্ষা দিচ্ছেন তা নয়। কেউ কেউ এ কথাও বলেন যে, বরং আল্লাহ তা'আলা জবাব দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ তাদেরকে গাফিল করে ফেলেছে। এ অর্থ বর্ণনা করা ভুল। সঠিক অর্থ হলো? হে আদম সন্তান! নিজেদের সম্মানিত প্রতিপালকের প্রতি তোমরা এতোটা উদাসীন হয়ে পড়লে কেন? কোন্ জিনিস তোমাদেরকে তাঁর অবাধ্যতায় উদ্ধত করেছে? কেনই বা তোমরা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লেগে পড়েছো? এটা তো মোটেই সমীচীন হয়নি। যেমন হাদীস শরীফে এসেছেঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ হে আদম-সন্তান! কোন জিনিস তোমাকে আমার সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করেছে? হে আদম সন্তান! তুমি আমার রাসূলদেরকে কি জবাব দিয়েছো?”

কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, মানুষকে বিভ্রান্তকারী হলো শয়তান। হযরত ফুযায়েল ইবনে আইয়ায (রঃ) বলেন, যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ “কিসে বিভ্রান্ত করেছে। তবে অবশ্যই আমি বলবো: তোমার লটকানো পর্দাই তোমাকে বিভ্রান্ত করেছে। আবু বকর আল আররাক (রঃ) বলেনঃ “কিসে তোমাকে তোমায় মহাম প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করেছে?” যদি এ প্রশ্ন আমাকে করা হয় তবে অবশ্যই আমি বলবো: অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহই আমাকে বিভ্রান্ত করেছে।

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّبَكَ فَعَدَلَكَ

৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসামঞ্জস্য করেছেন।

অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে তার সৃষ্টিকৌশল বর্ণনা করেছেন, যাতে সে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রতি অনুগত হয় এবং তাকে ভুলে শয়তানের তাবেদার না হয়। এখানে সৃষ্টি, বিন্যস্তকরণ ও সুষমকরণ, তিনটি অবস্থার কথা বলা হয়েছে। যার মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য বহু চিন্তার খোরাক রয়েছে।

প্রথমে বলা হয়েছে ‘যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন’। সৃষ্টি দু’রকমের। এক- অনন্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন। যেভাবে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয় (বাক্বারাহ ২/৩০-৩৯)। দুই- অস্তিত্ব থেকে পৃথক অস্তিত্বে আনয়ন। যেমন পিতা-মাতার মাধ্যমে সন্তানের জন্মগ্রহণ। এই সৃষ্টি করা হয়েছে স্বামীর শুক্রাণুর মাধ্যমে স্ত্রীর গর্ভে। ভ্রূণ সৃষ্টি করার পর তাকে হাত-পা, চোখ-কান ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ‘সুবিন্যস্ত’ করা হয় (সাজদাহ ৩২/৯)। যেমন এক হাত আরেক হাত থেকে বা এক পা আরেক পা থেকে দীর্ঘ না হওয়া। একইভাবে আঙ্গুলগুলি অসমভাবে খাটো ও লম্বা না হওয়া ইত্যাদি। অতঃপর তাকে ‘সুশম’ করা হয়। অর্থাৎ দেহের আকৃতি, প্রকৃতি, রক্তের গ্রুপ, দৈহিক শক্তি ও সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তি, স্বভাব-চরিত্র সবকিছুকে সুশম করা হয়। যেমন মুরগী শ্রেফ দু’পায়ে চলে ও গরু-ছাগল চার হাত-পা দিয়ে চলে। অথচ মানুষ সবাই দু’পা দিয়ে চলে ও দু’হাত দিয়ে কাজ করে। যদি এটা আল্লাহ না করতেন, তাহলে মানুষের মধ্যে পরস্পরে কোন সামঞ্জস্য থাকতো না। কেউ হতো ১০ হাত লম্বা, কেউ হতো দু’হাত লম্বা। কেউ ভাত-রুটি খেতো, কেউ ঘাস-পাতা খেতো। মানুষের সৃষ্টি ও চরিত্রের সামঞ্জস্য বিচার করে কোন খাদ্য, পানীয় বা ঔষধ তৈরী করা যেত না। দেহের মাপের আন্দায করে কোন পোষাকের ডিজাইন তৈরী হতো না। জামা-কাপড়, জুতা, স্যান্ডেল কিছুই বানানো যেত না। পরিবার, সমাজ ও দেশ পরিচালনার জন্য কোন সাধারণ নীতি-কৌশল বা আইনও তৈরী করা যেত না। ফলে পৃথিবীব্যাপী সৃষ্টি হতো এক দারুণ বিশৃংখলা।

বুসর বিন জাহাশ আল কুরাশী (রাঃ) বলেন: একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর হাতের তালুতে থুথু ফেলে তার ওপর আঙ্গুল রাখলেন এবং বললেন: আল্লাহ তা’আলা বলেছেন: হে আদম সন্তান! তুমি কি আমাকে অপারগ করতে পারবে? অথচ আমি তোমাকে এই রকম জিনিস হতে সৃষ্টি করেছি। তারপর সুঠাম করেছি এবং উত্তম গঠন ও আকৃতি দান করেছি। অতঃপর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে চলাফেরা করতে শিখিয়েছি। পরিশেষে তোমার ঠিকানা হবে মাটির গর্ভে। অথচ তুমি বড়ই অহংকার করছো, আমার পথে দান করা থেকে বিরত থেকেছো। তারপর যখন কণ্ঠনালীতে নিঃশ্বাস এসে যায় তখন বলছো; আমি দান খয়রাত করে আসি, এখন দান খয়রাত করার সময় কোথায়? (ইবনু মাযাহ হা. ২৭০৭, সনদ হাসান।)

فِي آيَةِ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ

৮. যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন।

এখানে মানুষ সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তদুপরি তোমার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সুবিন্যস্ত করেছেন। এরপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা’আলা সব মানুষকে, যাকে যেভাবে ইচ্ছা সে আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করতে পারেন। তিনি কোটি কোটি মানুষের আকার আকৃতি এমনভাবে গঠন করেছেন যে, পরস্পরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। আর তা আল্লাহ তা’আলার এক বড় নিদর্শন।

كَذَلِكَ نَبُذْنُ بِاللَّيْلِ

৯. কখনো নয়, তোমরা তো প্রতিদান দিবসে মিথ্যারোপ করে থাক

জিনিসটি তোমাকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে তার পেছনে আসলে কোন শক্তিশালী যুক্তি নেই। বরং দুনিয়ার এই কর্মজগতের পরে আর কোন কর্মফল জগত নেই, নিছক তোমার এ নির্বোধ ধারণাই এর পেছনে কাজ করেছে। এ বিভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন ধারণাই তোমাকে আল্লাহ থেকে গাফেল করে দিয়েছে। এরই ফলে তুমি আল্লাহর ন্যায় বিচারের ভয়ে ভীত হও না এবং এটিই তোমার নৈতিক আচরণকে দায়িত্বহীন বানিয়ে দিয়েছে।

এখানে ১৫ শব্দটি كَذَلِكَ শব্দের অর্থও হতে পারে। (অর্থাৎ, সত্যপক্ষে তোমরা শেষ বিচারকে মিথ্যা মনে করে থাক।) এখানে কাফেরদের সেই আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির খন্ডন করা হয়েছে, যা দয়াবান আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতের ব্যাপারে ধোঁকায় মগ্ন থাকার ফলে সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ, এই প্রবৃত্তির প্রতারণায় পড়ার কোন কারণ নেই। বরং আসল কথা হল যে, তোমাদের হৃদয়ে এ কথার প্রত্যয় নেই যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং সেখানে প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়া হবে।

وَأَنَّ عَلَيْكُمْ لَحُفَظِينَ

১০. আর নিশ্চয় নিয়োজিত আছেন তোমাদের উপর সংরক্ষকদল;

كِرَامًا كَاتِبِينَ

১১. সম্মানিত লেখকবৃন্দ;

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

১২. তারা জানে তোমরা যা কর।

এখানে إِنَّ ও ل দুটি নিশ্চয়তাবোধক অব্যয় দ্বারা তত্ত্বাবধায়ক ও লেখক ফেরেশতাদ্বয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

অত্র আয়াত তিনটিতে আল্লাহ স্বীয় বান্দাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন যে, তোমরা চাইলে কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করতে পারো, তাকে মিথ্যা বলতে পারো, তার প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করতে পারো কিন্তু এতে প্রকৃত সত্য বদলে যাবে না। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, তোমাদের রব এই দুনিয়ায় তোমাদেরকে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেননি। বরং তিনি তোমাদের প্রত্যেকের ওপর অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে রেখেছেন। তারা নিরপেক্ষভাবে তোমাদের সমস্ত ভালো ও মন্দ কাজ রেকর্ড করে যাচ্ছে। তোমাদের কোন কাজ তাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকছে না। তোমরা অন্ধকারে, একান্ত নির্জনে, জনমানবহীন গভীর জংগলে অথবা এমন কোন অবস্থায় কোন কাজ করে থাকলে যে সম্পর্কে তোমরা পূর্ণ নিশ্চিত থাকছো যে, তা সকল সৃষ্টির অগোচরে রয়ে গেছে, তারপরও তা তাদের কাছ থেকে গোপন থাকছে না।

এই তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের জন্য আল্লাহ “কিরামান কাতেবীন” كِرَامًا كَاتِبِينَ শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ লেখকবৃন্দ যারা করীম (অত্যন্ত সম্মানিত ও মর্যাদাবান)। তাদের কারোর সাথে ব্যক্তিগত ভালোবাসা বা শত্রুতা নেই। ফলে একজনের প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব এবং অন্যজনের অযথা বিরোধিতা করে সত্য বিরোধী ঘটনা রেকর্ড করার কোন অবকাশই সেখানে নেই। তারা খেয়ানতকারীও নয়। ডিউটি ফাঁকি দিয়ে নিজেদের তরফ থেকে খাতায় উল্টো সিঁথে লিখে দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তারা ঘুষখোরও নয়। নগদ কিছু নিয়ে কারো পক্ষে বা কারো বিপক্ষে মিথ্যা রিপোর্ট দেবার কোন প্রশ্নই তাদের ব্যাপারে দেখা দেয় না। এসব যাবতীয় নৈতিক দুর্বলতা থেকে তারা মুক্ত। তারা এসবের অনেক উর্ধ্বে। কাজেই সৎ ও অসৎ উভয় ধরনের মানুষের নিশ্চিত থাকা উচিত যে, তাদের প্রত্যেকের সৎকাজ হুবহু রেকর্ড হবে এবং কারোর ঘাড়ে এমন কোন অসৎকাজ চাপিয়ে দেয়া হবে না, যা সে করেনি। তারপর এই ফেরেশতাদের দ্বিতীয় যে গুণটি বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছেঃ “তোমরা যা কিছু করো তা তারা জানে।” অর্থাৎ তাদের অবস্থা দুনিয়ার সি, আই, ডি ও তথ্য সরবরাহ এজেন্সিগুলোর মতো নয়। সব রকমের প্রচেষ্টা ও সাধ্য-সাধনার পরও অনেক কথা তাদের কাছ থেকে গোপন থেকে যায়। কিন্তু এ ফেরেশতারা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেকটি কাজ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত। সব জায়গায় সব অবস্থায় সকল ব্যক্তির সাথে তারা এমনভাবে লেগে আছে যে, তারা জানতেই পারছে না যে, কেউ তাদের কাজ পরিদর্শন করছে। কোন ব্যক্তি কোন নিয়তে কি কাজ করেছে তাও তারা জানতে পারে। তাই তাদের তৈরি করা রেকর্ড একটি পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড। এই রেকর্ডের বাইরে কোন কথা নেই। এ সম্পর্কেই সূরা কাহাফের ৪৯ আয়াতে বলা হয়েছেঃ কিয়ামতের দিন অপরাধীরা অবাক হয়ে দেখবে তাদের সামনে যে আমলনামা পেশ করা হচ্ছে তার

মধ্যে তাদের ছোট বড় কোন একটি কাজও অলিখিত থেকে যায়নি। যা কিছু তারা করেছিল সব হুবহু ঠিক তেমনিভাবেই তাদের সামনে আনা হয়েছে।

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ

১৩. পুণ্যবানেরা তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে

وَالْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ

১৪. আর পাপাচারীরা তো থাকবে জাহান্নাম

এখানে মানুষকে আবরার ও ফুজ্জার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ‘আবরার’ একবচনে اَبْرَرُ এরা তারাই যারা সংকর্মশীল ও খাঁটি ঈমানদার। যারা আল্লাহ প্রদত্ত ফরয-ওয়াজিবসমূহ ঠিকমত আদায় করে এবং নিষেধসমূহ হ’তে বিরত থাকে। পক্ষান্তরে ‘ফুজ্জার’ একবচনে فَجْرُ এরা তারাই যারা এর বিপরীত। অর্থাৎ ফাসিক-মুনাফিক, কাফির-মুশরিক সবাই এই দলভুক্ত।

এই দুই দল বিষয়ে আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, ‘একদল জান্নাতে ও একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে’ (শূরা ৪২/৭)। দু’দলের এই বিভক্তি তাদের আকীদা ও আমল তথা বিশ্বাস ও কর্মের ভিত্তিতে হবে।

পুণ্যবানেরা কি কি নেয়ামতে থাকবে সেটা জানতে হলে আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের অন্যত্র একটু দেখতে হবে। অন্যত্র এসেছে, “অবশ্যই পুণ্যবানদের আমলনামা ‘ইল্লিয়ীনে, ‘ইল্লিয়ীনে সম্পর্কে আপনি কী জানেন? ওটা চিহ্নিত ‘আমলনামা। যারা আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত তারা তা দেখে। পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে, তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে। আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবেন। তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় হতে পান করান হবে; ওটার মোহর মিসকের, এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। ওটার মিশ্রণ হবে তাসনীমের; তা একটা প্রস্রবণ, যা থেকে সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করে। [সূরা আল মুতাফফিফীন; ১৮-২৮]

পাপাচারীরা কি কঠিন শাস্তিতে থাকবে সেটা জানতেও আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের অন্যত্র দেখতে হবে, সেখানে বলা হয়েছে, “কখনো না, পাপাচারীদের আমলনামা তো সিজ্জীনে আছে। সিজ্জীন সম্পর্কে আপনি কী জানেন? ওটা চিহ্নিত ‘আমলনামা। সেদিন দুর্ভোগ হবে অস্বীকারকারীদের, যারা কর্মফল দিনকে অস্বীকার করে, শুধু প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারী এটাকে অস্বীকার করে; তার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে সে বলে, “এটা পূর্ববর্তীদের উপকথা। কখনো নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জড় ধরিয়েছে। না, অবশ্যই সেদিন তারা তাদের প্রতিপালক হতে অন্তরিত থাকবে; তারপর তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে; তারপর বলা হবে, “এটাই তা যাকে তোমরা অস্বীকার করতে।” [সূরা আল-মুতাফফিফীন: ৭-১৭]

يُضَوَّنَهَا يَوْمَ الدِّينِ

১৫. তারা প্রতিদান দিবসে তাতে দগ্ধ হবে,

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ

১৬. আর তারা সেখান থেকে অন্তর্হিত হতে পারবে না।

যে প্রতিদান ও শাস্তির দিনকে তারা অবিশ্বাস করত, সেই দিনেই নিজ নিজ আমলের প্রতিদান হিসাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

আযাব থেকে কবরে ও জাহান্নামে কখনোই তাদের অবকাশ দেওয়া হবে না। বরং তারা সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। এখানে কেবল জাহান্নামে প্রবেশ করা ও তার শাস্তির কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল বান্দাকে এ থেকে ভয় প্রদর্শন করা। নইলে জাহান্নামীরা যেমন সেখানে প্রবেশ করবে, জান্নাতীরাও তেমনি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

وَمَا أَذْرِكُ مَا يَوْمُ الدِّينِ

১৭. আর কিসে আপনাকে জানাবে প্রতিদান দিবস কী?

ثُمَّ مَا أَذْرِكُ مَا يَوْمُ الدِّينِ

১৮. তারপর বলি, কিসে আপনাকে জানাবে প্রতিদান দিবস কী?

কিয়ামতের দিনের ভয়ংকর অবস্থা বুঝানোর জন্য প্রশ্নবোধক বাক্যটি পরপর দু'বার আনা হয়েছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, الْقَارِعَةُ، مَا الْقَارِعَةُ، وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ‘করাঘাতকারী’ ‘করাঘাতকারী কি?’ ‘তুমি কি জানো করাঘাতকারী কি?’ (ক্বার’আহ ১০৩/১-৩)। করাঘাতকারী অর্থ কিয়ামত কথাটি বারবার প্রশ্নবোধক বাক্য প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রোতার কর্ণকুহর থেকে তার হৃদয়ের গভীরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানেও একইভাবে বলা হয়েছে। যাতে বান্দার অন্তরে কিয়ামত বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহ উঁকি-বুকি মারতে না পারে। অতঃপর সেদিনের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে,

يَوْمَ لَا تَنْبِلُكَ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ

১৯. সেদিন কেউ কারও জন্য কিছু করার মালিক হবে না; আর সেদিন সব বিষয়ের কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর।

দুনিয়াতে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা মানুষ ব্যবহার করে প্রায় স্বাধীনভাবে। কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কেউ কারু সামান্যতম উপকার করতে পারবে না। দুনিয়ার জেলখানায় তার নমুনা রয়েছে। এখানে কারা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কেউ কারু প্রতি মানবিক সাহায্য পর্যন্ত করতে পারে না।

কিয়ামতের দিন আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ কারু জন্য সুপারিশ করতে পারবে না’ মর্মে অনেকগুলি আয়াত এসেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, ‘এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকটে সুপারিশ করতে পারে?’ (বাক্বারাহ ২/২৫৫)। তিনি আরও বলেন, ‘তারা (ফেরেশতারা) সুপারিশ করতে পারে কেবল তার জন্য যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট’ (আম্বিয়া ২১/২৮)। তিনি বলেন, ‘তাদের কোন সুপারিশ কাজে আসবে না। যতক্ষণ না আল্লাহ অনুমতি দেন যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট’ (নাজম ৫৩/২৬)। এছাড়াও রয়েছে সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে স্বীয় কওমের উদ্দেশ্যে রাসূল (সাঃ)-এর দেওয়া সেই যুগান্তকারী ভাষণ, ‘হে বনু আবদে মানাফ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। কেননা আমি তোমাদেরকে আল্লাহর হাত থেকে বাঁচানোর কোনই ক্ষমতা রাখি না’।

প্রশ্ন হতে পারে, দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কর্তৃত্ব আল্লাহর। তাহলে বিশেষ করে ঐদিন ‘সব কর্তৃত্ব আল্লাহর’ বলার কারণ কি? জবাব এই যে, আল্লাহর হুকুমে দুনিয়াতে মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন। এটা হল তার জন্য স্বাধীন জগত (عالم اختياري)। কিন্তু আখেরাত হল বাধ্যগত জগত (عالم اضطراري)। সেখানে তার নিজস্ব ইচ্ছা চলবে না। কেবলমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত। আল্লাহ সেদিন বলবেন, ‘আজ কর্তৃত্ব কার? কেবলমাত্র আল্লাহর। যিনি এক ও মহাপরাক্রান্ত’। ‘আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বদলা দেওয়া হবে। আজ কারু প্রতি যুলুম করা হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব সম্পাদনকারী’ (গাফির/মুমিন ৪০/১৬-১৭)।

ফুটনোট

কিয়ামতের দিনের বর্ণনা:

- আসমান বিদীর্ণ হবে, নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে, এবং সাগর একাকার হয়ে বিস্ফোরিত হবে।
- সাগরের বিস্ফোরণের ঘটনা ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, ভূমিকম্পের ফলে সাগরের তলদেশ ফেটে যাবে, আর পানির সংস্পর্শে এসে গরম লাভা থেকে একপ্রকার চেইন রিয়াকশন সৃষ্টি হবে, যা সাগরে আগুন লাগিয়ে দেবে।

পুনরুত্থান ও কবর থেকে জীবিত হওয়া: কবর খুলে মৃতদের জীবিত করা হবে। এটি কিয়ামতের দ্বিতীয় ধাপকে নির্দেশ করে। এই সময়ে প্রত্যেক ব্যক্তি তার জীবনের প্রতিটি কাজ ও তার প্রভাব সম্পর্কে জেনে নেবে।

কর্মফল ও হিসাব-নিকাশ: প্রত্যেক ব্যক্তি জানবে সে কী কাজ আগে পাঠিয়েছে এবং কী কাজ পিছনে রেখে গেছে। সৎ কাজ হলে তার সওয়াব চলতে থাকবে, আর অসৎ কাজের গুনাহও আমলনামায় লিপিবদ্ধ থাকবে।

মানুষের গাফিলতির সমালোচনা: আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন, “হে মানুষ! তোমার সম্মানিত প্রতিপালকের প্রতি তোমাকে কী বিভ্রান্ত করল?” এই প্রশ্নের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করছেন তাদের গাফিলতি ও অবাধ্যতার ব্যাপারে। মানুষের বিভ্রান্তি হতে পারে শয়তানের ধোঁকায় অথবা আল্লাহর অনুগ্রহকে ভুলভাবে গ্রহণ করার কারণে।

সৃষ্টি ও গঠন: আল্লাহ আমাদের প্রথমত সৃষ্টি করেছেন, তারপর আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং শেষত সুসামঞ্জস্য দিয়েছেন। প্রতিটি মানুষের গঠন এবং প্রকৃতি এমনভাবে তৈরি করেছেন যাতে তারা স্বতন্ত্র কিন্তু সুসঙ্গত।

মানব জীবনের সুষমতা: আমাদের দৈহিক ও মানসিক গঠন এমনভাবে তৈরি করেছেন যে তা সমন্বিত ও কার্যকর। এর মধ্যে রয়েছে দেহের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য এবং স্বভাব-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

কিয়ামতের দিন ও বিচার: এই জীবনে যে প্রতিটি কাজ করা হচ্ছে তা ফেরেশতারা লিখে রাখছেন। পরকালে, আখিরাতের দিনে, সবকিছুর বিচার হবে। ভালো কাজের জন্য জান্নাত এবং মন্দ কাজের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত থাকবে।

অস্বীকারকারীদের সতর্কীকরণ: যারা আখিরাতকে অস্বীকার করে, তারা যেন এ কথা মনে রাখে, তাদের কোনো কাজই আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে নয়। তাদের জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে।

আবরার ও ফুজ্জার:

আবরার (পুণ্যবান): জান্নাতে থাকবে আরাম-আয়েশ ও সম্মানের সাথে।

ফুজ্জার (পাপাচারী): জাহান্নামের শাস্তিতে থাকবে, যেখান থেকে তারা মুক্তি পাবে না।

সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব আল্লাহর: দুনিয়াতে মানুষ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, কিন্তু আখিরাতের দিনে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো কাজ সম্ভব নয়। আল্লাহর একক কর্তৃত্ব সেদিন স্পষ্ট হয়ে উঠবে।